রবীন্দ্রনাথের সুরের নাটক

আবদুর রউফ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ নিজের সঙ্গীত-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করার বাসনায় দেশী সঙ্গীতের সাহায্য যেমনি নিয়েছিলেন তেমনি বিলেতি সুরের মাধুর্যতায় তিনি মুগ্ধও হয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য-সঙ্গীতভাবনা ও উপস্থাপনকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে অল্প বয়সেই। রবীন্দ্রনাথ বিলেত যাওয়ার আগেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে পাশ্চাত্ত্য-সঙ্গীতের একটি পরিমণ্ডল ছিল, যা গড়ে ওঠেছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলেই, তিনি 'ইটালীয় ও ফরাসী' সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন; আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চত্ত্য-সঙ্গীতে তালিম নিয়েছিলেন, এমনকী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিয়ানো ও বিলেতি বাঁশি বাজাতে শিখেছিলেন; হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছেলে ও মেয়েদের জন্য ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন, তাঁর কন্যা প্রতিভাদেবী পিয়ানো বাজাতেন 'ওস্তাদী বিলেতী' ঢঙে; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরাদেবী উভয়ই ইউরোপীয় সঙ্গীতের শিক্ষা 'ভালোভাবেই' পেয়েছিলেন; স্বর্ণকুমারীদেবীর কন্যা সরলাদেবীকে ইউরোপীয় সঙ্গীত ও পিয়ানো শেখানোর জন্য একজন 'মেম শিক্ষয়িত্রী' নিয়োগ করা হয়েছিল; আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পিয়ানো, বেহালা, হারমোনিয়ম, অর্গান প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বিলেতি গান ও সুরের চর্চা করতেন।[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেতি সুরের সঙ্গে পরিচিত হন; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নূতন নূতন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।'[২]

'ঊনবিংশ শতকে বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁরা ইয়োরোপীয় সঙ্গীত ও অভিনয়কে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং যাঁরা তারই প্রভাবে নতুন পথের সন্ধানে উৎসাহিত হয়েছিলেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।'[৩] শুধু ঠাকুর-বাড়িতেই নয়, সারা কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সে-সময়ে ইউরোপীয় আদর্শে নাচ, গান ও শখের থিয়েটারের পরিবেশ গড়ে ওঠে। কলকাতায় প্রথম বিলেতি থিয়েটার স্থাপন করা হয় ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে। ইংরেজই যে শুধু এসবে অভিনয় বা গান-বাজনা করার জন্য অংশগ্রহণ করত তা নয়, ইতালিয়ান ও

[১] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।
[২] ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।
[৩] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।

জার্মান শিল্পীরাও জড়িত ছিল। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সংস্কৃতি-মনা বাঙালি পরিবারগুলিও বিদেশী থিয়েটারের প্রতি বিশেষ উৎসাহী হয়ে পড়ে, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'ওথেলো'তে একজন বাঙালি যুবক একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেন।[৪]

'অপেরা'র অনুকরণে বাংলাভাষায় সুরের নাটক রচনা ও অভিনয়ের প্রবল ঝোঁক দেখা দেয় সে-সময়কার কলকাতার যুবসমাজে। 'অপেরা' বলতে বোঝায় একধরণের নাটক যাতে পাত্রপাত্রীর সমস্ত কথাবার্তা সুরের ঢঙে প্রকাশ পায়; যাকে বাংলায় সুরের নাটক বলা যেতে পারে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে, ইউরোপীয় থিয়েটারের অনুকরণে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ)-এ 'বিদ্যাসুন্দর' বাংলা নাটকটি অভিনীত হয়; এই নাটকেই সর্বপ্রথম অর্কেস্ট্রা ব্যবহার করার সূত্রপাত ঘটে।[৫] তারপর শখের থিয়েটারের বদলে সৃষ্টি হয় পেশাদারী 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ও বিদেশী পেশাদারী 'অপেরা'র দলের অনুকরণে নাটকগুলি। ৩১শে জুলাই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগান-বাড়িতে 'রত্নাবলী' অভিনীত হয়।[৬] ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর উদ্যোগে বাংলা সুরের নাটক 'কামিনীকুঞ্জ' অভিনীত হয়, এর নায়িকা ছিলেন শ্রীমতী কাদম্বিনী, তিনি নৃত্য ও সঙ্গীতের দ্বারা দর্শককে মুগ্ধ করেন, ফলে এই নাটকটি বাংলার দর্শকসমাজে বিশেষভাবে সাড়া জাগায়; '[...] ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত এই নাটকটি বাংলার নাট্য ইতিহাসের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার একটা কারণ হল, এই প্রকারের গীত-নাটক বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম। আর দ্বিতীয় কারণ হল যে, এই নাটকই পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটক 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার পথ সহজ করেছিল।'[৭] পূবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার ছিল সে-যুগের কলকাতা শিক্ষিত-সমাজের অন্যতম; তাই ত ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী'; এর 'দ্যাখ্‌রে জগৎ মেলিয়া নয়ন' ও 'প্রেমের কথা আর বোলো না' গান-দুটোতে ইউরোপীয় সুরের সন্ধান মিলে; আর রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেত তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে স্বর্ণকুমারীদেবীর রচিত সঙ্গীতের এক মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত 'বসন্তোৎসব' সুরের নাটকটিও অভিনীত হয় ঠাকুরবাড়ির 'বিদ্বজ্জনসমাগম সভা'র আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে; 'জোড়াসাঁকো হইতে কাব্য নাট্যের সৃজন প্রথম এই 'বসন্ত উৎসবে'ই।'[৮] সরলাদেবী চৌধুরাণী বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের বিলাত-নিবাস-কালেই আমার মায়ের রচিত 'বসন্তোৎসব' গীতনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্গীতের এক মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ি তখন।'[৯] পুরোপুরি 'অপেরা' জাতীয় সুরের নাটকের ছাঁচেই রচিত হয় এই নাটকটি, যা ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বিলেতে এসে আঠারো বছর বয়সে কবি ম্যুরের 'আইরিশ মেলডিজ'-এর গান শিখেন, তারপর উনিশ বছর বয়সে দেশে ফিরে বিলেতি সঙ্গীতের সুর তাঁর নিজের গানে ব্যবহার এবং দেশী-বিলেতি সুরের সাহায্যে সুরের নাটক লিখতে শুরু করেন। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ যখন ফেব্রুয়ারি মাসে (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে) স্বদেশে ফিরে আসেন তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানময়ী' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন চলছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এতে অভিনয় করেন। তিনি ছিলেন 'সৃষ্টিমূলক কাজে সকলের অগ্রণী'[১০], তাই তাঁর হাতে দেশী ও বিলেতি সুরের প্রভাবে সৃষ্টি হতে থাকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা'।

[৪] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।
[৫] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।
[৬] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।
[৭] বাঙালী জীবনে বিলিতি সংস্কৃতির প্রভাব; শান্তিদেব ঘোষ; দেশ, ২১শে জুন ১৯৬৯।
[৮] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।
[৯] জীবনের ঝরাপাতা, সরলাদেবী চৌধুরাণী, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।
[১০] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।

বাল্মীকি-প্রতিভা[১১]

'[...] দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি; কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌঁড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।'[১২] ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে স্বদেশে ফিরেই বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সন্নিবেশে তাঁর প্রথম সুরের নাটক 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনা করেন, এতে গদ্য বা পদ্যের সংলাপ নেই, শুধু নাটকের বিষয়বস্তুটি সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা– অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। [...] সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টি সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র– স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।'[১৩] 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র আখ্যানভাগ হচ্ছে এরকম– রত্নাকর নামে এক দস্যু-সর্দার রাতে, বনের মধ্যে, কালীপূজা করেন নরবলি দিয়ে। একদিন তার একজন অনুচর বলির উদ্দেশ্যে একটি মেয়েকে ধরে আনলে রত্নকর (বাল্মীকি) পূজা শেষে তাকে বলি দেওয়ার জন্য উদ্যত হন, কিন্তু হঠাৎ-ই তার মনে পরির্বতন ঘটে, কারণ মেয়েটির করুণ কান্নায় তার হৃদয়ে আঘাত হানে; সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির বাঁধন খুলে তাকে মুক্তি দিতে আদেশ করেন, তারপর তিনি দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে থাকেন, এবং একসময় তিনি অলৌকিক আনন্দে পূর্ণ হয়ে কবিত্ব-শক্তি লাভ করেন। এরইমধ্যে দেবী লক্ষ্মী তার সামনে আবির্ভূত হন; এবং তিনি ধনের বর দিতে চান; কিন্তু বাল্মীকি তা গ্রহণ করেন; কারণ তিনি চান বিদ্যা, 'কবিতাময় জগৎ চরাচর' করার জন্য। তখন সরস্বতী তার সামনে এসে উপস্থিত হন। দেবীকে দেখে রত্নকর (বাল্মীকি) খুশি হন। দেবী প্রকাশ করেন যে, তিনি নরবলির জন্যে আনা মেয়েটির বেশে তার সম্মুখে এসে আরেকবার হাজির হয়েছিলেন। বাল্মীকির দয়া দেখে তিনি সন্তুষ্ট হওয়ায় তিনি তাকে বরদান করেন, তিনি বলেন, 'এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার!/ যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।'

যদিও কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ থেকে এই কাহিনীর আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন, তবুও মূল-রামায়ণের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই, তবে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল'-এর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '[...] কিছু পূর্বেই আর্যদর্শনে বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সংগীত বাহির হইয়া আমাদের সকলকেই মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এই কাব্যে বাল্মীকির কাহিনী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহারই সঙ্গে দস্যু রত্নাকরের বিবরণ জড়াইয়া দিয়া এই নাটকের গল্পটি একরূপ খাড়া হইল।'[১৪] 'সারদামঙ্গল' ও 'বাল্মীকি-প্রতিভা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, 'এই সারদামঙ্গলের আরম্ভ-সর্গ হইতে বাল্মীকিপ্রতিভার ভাবটি আমার মাথায় আসে এবং সারদামঙ্গলের দুই-একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকিপ্রতিভায় গান রূপে স্থান পাইয়াছে।'[১৫] প্রশান্তকুমার পালের গবেষণা অনুযায়ী 'সারদামঙ্গল'-এর প্রথম সর্গের যে কয়েকটি অংশ অবিকৃতভাবে বা অল্প পরিবর্তিত আকারে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে,

১. (ক) সারদামঙ্গল: 'কমলা ঠমকে হাসি/ ছড়ান রতনরাশি'—১৮শ স্তবক।

(খ) বাল্মীকিপ্রতিভা: 'কমলা দিতেছে আসি রতন রাশি রাশি'—অ-১।

---

[১১] টীকা: বেঙ্গল লাইব্রেরির তথ্য অনুযায়ী 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গ্রন্থাকারে ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রশান্তকুমার পালের গবেষণা অনুযায়ী আখ্যাপত্র ছাড়াই এ-গ্রন্থের মলাটে লিখা ছিল, 'বাল্মীকি-প্রতিভা।/ গীতি-নাট্য।/ বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে।/ রচিত ও অভিনীত।/ কলিকাতা।/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে।/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তি দ্বারা/ মুদ্রিত।/ ফাল্গুন ১৮০২ শক।/ মূল্য ।০ চারি আনা।' – রবিজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল, খণ্ড দুই (প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪)।

[১২] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।

[১৩] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।

[১৪] জীবনস্মৃতি, দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি ও প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮।

[১৫] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।

২. (ক) সারদামঙ্গল: 'যাও লক্ষ্মী অলকায়,/ যাও লক্ষ্মী অমরায়,/ এস না এ যোগি জন-তপোবন-স্থলে!'—২০শ স্তবক ।

(খ) বাল্মীকিপ্রতিভা: 'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,/ এ বনে এস না, এস না, এস না এ দীনজনকুটীরে!'—অ-১ ।

৩. (ক) সারদামঙ্গল: 'ভক্তি ভাবে এক তানে/ মজেছি তোমার ধ্যানে;/ কমলার ধন-মানে নহি অভিলাষী ।'—৩১শ স্তবক ।

(খ) বাল্মীকিপ্রতিভা: 'যে বীণা শুনেছি কানে, মনপ্রাণ আছে ভোর—/ আর কিছু চাহি না, চাহি না!'—অ-১ ।

৪. (ক) সারদামঙ্গল: 'এস মা করুণারাণী,/ ও বিধু-বদনখানি/ হেরি, হেরি, আঁখি ভরি হেরি গো আবার!/ .../ এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার ।'—২০শ স্তবক ।

(খ) বাল্মীকিপ্রতিভা: 'এস, মা করুণারাণী, ও বিধু-বদনখানি/ হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার ।/ এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার ।'—অ-১ ।

৫. (ক) সারদামঙ্গল: 'অদর্শন হ'লে তুমি,/ ত্যজি লোকালয় ভূমি,/ অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে;/ হেরে মোরে তরুলতা/ বিষাদে কবে না কথা,/ বিষণ্ন কুসুমকুল বন-ফুল-বনে!/ 'হা দেবী, হা দেবী', বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি;'—৩৩শ স্তবক ।

(খ) বাল্মীকিপ্রতিভা: 'অদর্শন হ'লে তুমি ত্যেজি লোকালয়ভূমি,/ অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে—/ হেরে মোরে তরুলতা বিষাদে কবে না কথা,/ বিষণ্ন কুসুমকুল বনফুল-বনে ।/ 'হা দেবী', 'হা দেবী' বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,'—অ-১ ।[১৬]

আর 'বসন্তোৎসব'-এর সঙ্গে সংলাপ ও কাব্যগুণের দিক থেকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'-কে তুলনা করা যায় বলে পণ্ডিতরা মনে করেন– সেগুলি হচ্ছে,

(১) বসন্তোৎসব—'কুমার । আ মরি, লাবণ্যময়ী কে ও স্থির-সৌদামিনী,/ পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে মার্জ্জিত বদনখানি!' —২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক;

(২) বাল্মীকিপ্রতিভা—'বাল্মীকি । একি এ, একি এ, স্থিরচপলা!/ কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা ।/ কি প্রতিমা দেখি এ,/ জোছনা মাখিয়ে/ কে রেখেছে আঁকিয়ে/ আ মরি কমলপুতলা!' —অ-১ ।[১৭]

'সারদামঙ্গল' বা 'বসন্তোৎসব'-এর প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনা করলেও মানব-সম্পর্ক ও মনস্তত্ত্বের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তার স্বাতন্ত্র্যতা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল । তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর-মহলে পা দিয়েছি; মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জালবুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল । বাল্মীকিপ্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা । এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায় । একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে ।'[১৮]

[১৬] রবিজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল, খণ্ড দুই (প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪) ।
[১৭] রবিজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল, খণ্ড দুই (প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪) ।
[১৮] সূচনা, বাল্মীকি-প্রতিভা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' যেহেতু সুরের নাটক সেহেতু এর গানগুলি নিয়েই আলোচনা করা আবশ্যক। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '[...] বাল্মীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া।'[১৯] 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বর্তমান সংস্করণে যেসব গান পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে,

> প্রথম দৃশ্য– অরণ্যে। 'দস্যুগণ': 'আজকে তবে মিলে সবে কর্‌ব লুঠের ভাগ' (কাফি); 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' (খাম্বাজ); 'এখন কর্ব' কি বল্!' (পিলু); 'শোন্ তোরা তবে শোন্' (ঝিঁঝিট); 'তবে আয় সবে আয়' (বেলাবতী); 'কালী কালী বলো রে আজ' (জংলা ভূপালি); 'এ কি ঘোর বন! এনু কোথায়' (দেশ-বেহাগ) ও 'পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে?' (পিলু)।
>
> দ্বিতীয় দৃশ্য– অরণ্যে কালীপ্রতিমা। 'বাল্মীকি স্তবে আসীন': 'নিশুম্ভমর্দ্দিনী অম্বে' (কানাড়া); 'দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা' (কাফি); 'নিয়ে আয় কৃপাণ, হয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা' (কানাড়া); 'কি দশা হ'ল আমার, হায়!' (গারা ভৈরবী); 'এ কেমন হ'ল মন আমার' (সিন্ধু ভৈরবী); 'আরে, কি এত ভাবনা, কিছু ত বুঝি না' (পরজ) ও 'শোন্ তোরা শোন্, এ আদেশ' (বাঙালি)।
>
> তৃতীয় দৃশ্য– অরণ্য। 'বাল্মীকি': 'ব্যাকুল হয়ে বনে বনে' (খাম্বাজ); 'আর না, আর না, এখানে আর না' (নটনারায়ণ); 'জীবনের কিছু হল না, হায়!' (হাম্বির); 'থাম্ থাম্! কি করিবি বধি পাখীটির প্রাণ!' (সিন্ধু ভৈরবী); 'কী বলিনু আমি!—একি সুললিত বাণী রে!' (বাহার); 'একি এ, একি এ, স্থিরচপলা!' (ভূপালি); 'কোথা লুকাইলে?' (টোড়ী); 'কেন গো আপনমনে ভ্রমিছে বনে বনে, সলিল দুনয়নে' (সিন্ধু); 'আমার কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা!' (টোড়ী); 'এই যে হেরি গো দেবী আমারি!' (বাহার); 'হৃদয়ে রাখ, গো দেবি, চরণ তোমার' (গৌড় মল্লার) ও 'দীনহীন বালিকার সাজে' (গান নয়, আবৃত্তি)।[২০]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'[২১] গানটির প্রথম পঙক্তি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দস্যুদের গান হিশেবে 'একডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটি ১২৮৩ বঙ্গাব্দে রচনা করেন।[২২] 'নিশুম্ভমর্দ্দিনী অম্বে' গানটি দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়ে পরিবর্তে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচিত 'রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা' গানটি ব্যবহৃত হয়।[২৩] 'কি দশা হ'ল আমার, হায়!' গানটির মূলসুর হচ্ছে একটি ফারসী গান 'হালমে রবে রবা'।[২৪] 'এই যে হেরি গো দেবী আমারি!' গানটি একটি হিন্দিগান থেকে নেওয়া হয়েছে।[২৫] 'ব্যাকুল হয়ে বনে বনে' গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ব্যাকুল হয়ে তব আশে' ব্রহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে সাদৃশ্য আর 'হৃদয়ে রাখ, গো দেবি, চরণ তোমার' গানটি বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রথমসর্গ থেকে নেওয়া হয়।[২৬] ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় যুক্ত করেন 'মরি ও কাহার বাছা' গানটি, যা 'কালমৃগয়া'র 'মানা না মানিলি' গানের সুর ব্যবহার করে রচনা করেন; এছাড়াও তিনি 'এনেছি মোরা এনেছি মোরা'সহ অন্যান্য গানগুলি এ-সময়েই 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় সংযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '[...] যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে

---

[১৯] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।

[২০] বাল্মীকি-প্রতিভা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।

[২১] টীকা: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকের ১ম সংস্করণে (৯ই জুলাই ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ) এই গানটি ছিল না, তবে ২য় সংস্করণে (১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ) গৃহীত ও ৩য় সংস্করণে (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) বর্জিত হয়।

[২২] রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১৩৪০।

[২৩] রবিজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল, খণ্ড দুই (প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪)।

[২৪] রবীন্দ্রস্মৃতি, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

[২৫] রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১৩৪০।

[২৬] রবিজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল, খণ্ড দুই (প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪)।

মন্দগতিতে দস্তর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌঁড় করাইবামাত্র সেই বিপবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত ।'[২৭]

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বিলেতি সুরের ভাঙাগান হচ্ছে তিনটি; যথা– 'তবে আয় সবে আয়', 'কালী কালী বল রে আজ' ও 'মরি ও কাহার বাছা' । রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করে বলেছেন যে, গুটি তিনেক গান বিলেতি সুর থেকে নেওয়া হয়েছে । দুটোকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হয়েছে এবং অন্যটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপের গানরূপে বসানো হয়েছে ।[২৮] কারণ, এরকম 'ঘোরতর উল্লাসের সুর' ইংরাজি রাগিণীতে আছে, ভারতবর্ষীয় রাগিণীতে নেই ।[২৯]

(১) 'তবে আয় সবে আয়': মূলগানটি হচ্ছে একটি শৃগালশিকারের গান, যার সুর প্রাচীন লোকগীতি 'বনি অ্যানি'-এর সুর থেকে নেওয়া । ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের কোনও একসময় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে শৃগালশিকার ব্যসন-ক্রীড়া হিশেবে শুরু হয় । ১৯ শতকের মাঝামাঝি জন্ পীল (জন্ জর্জ হুয়াইট-মেদভিল) একজন সুপরিচিত ইংরেজ ঔপন্যাসিক সুদক্ষ শিকারী হিশেবে খ্যাতিলাভ করেন । তিনি শৃগালশিকারী হিশেবে সেরা বলে গণ্য হন । তিনি ইংল্যাণ্ডের লেইক ডিস্ট্রিক্ট অঞ্চলে শৃগালশিকার করে বেড়াতেন । ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে শৃগালশিকারের সময় জন্ পীলের মৃত্যু হলে তাঁর বন্ধু জন্ উড্‌কক্ গ্রেইভস্ মূলগানটি রচনা করেন । রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেত (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) তখন এই শৃগালশিকারের গানটি ব্রিটেনে বহুলপ্রচিলত ছিল ।[৩০] গবেষণা অনুযায়ী মূলগান ও এই ভাঙাগানটির মধ্যে যেসব মিল পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে,

(ক) ভাবের দিক থেকে, শৃগালশিকারের গানটির উন্মত্ততার সুরকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র 'ডাকাতদের মত্ততা'র গানের উপযোগী সুর বলে মনে করা হয় ।[৩১]

(খ) দুটি গানের ছন্দই ৪/৪ ।[৩২]

(গ) দুটি গানের প্রথম অংশে সুরের মিল পাওয়া যায় ।[৩৩]

বর্তমান যুগে পশু-পাখির উপর নিষ্ঠুরতার অভিযোগে শিকারের জনপ্রিয়তা কমে গেলেও নূতন নূতন কথা সংযোজন করে মূলগানটির সুর-ব্যবহার আজও চলে আসছে । অ্যামেরিকায় এই সুরটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, অনেক ক্লাবের সদস্য ও কলেজের ছাত্ররা তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী-সঙ্গীত হিশেবে এই সুরটি গ্রহণ করে আসছে । ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে পেপসিকোলা তাদের রেডিও বিজ্ঞাপনে এই সুরটি ব্যবহার করায় এর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায় ।

(২) 'কালী কালী বল রে আজ': মূলগানটি হচ্ছে 'নান্সি লী'[৩৪], যা ১৯ শতকের বহু প্রাচীন গাঁথা বা ইংলিশ লোকগীতি হিশেবে গণ্য গানগুলির মধ্যে একটি; এর রচিয়তা খ্যাতনামা ইংরেজ গীতিকার, অক্সফোর্ডের অধ্যাপক, ব্রিস্টলের আইনজীবী ও আইন-বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের গ্রন্থকার ফ্রেডেরিক ই. ওয়েদার্লি (১৮৪৮-১৯৩৩); তবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন কয়েক হাজার গানের গীতিকার হিশেবেই; তাঁর ১,৫০০টি গানের মধ্যে 'নান্সি লী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন অনেকেই একে নাকচ করে দেন, তবে দেড় বছরের মধ্যে ৭০ হাজার কপি ইংল্যাণ্ডেই

[২৭] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ।
[২৮] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ।
[২৯] সংগীত ও ভাব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম প্রকাশ: ভারতী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ ।
[৩০] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭ ।
[৩১] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭ ।
[৩২] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭ ।
[৩৩] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭ ।
[34] Nancy Lee (1876); The Parlour Song Book - A Casquest of Vocal Gems, Edited by M. R. Turner, Published by Pan Books Ltd, London.

বিক্রি হয়; এর সুরকার স্টেপেন্ আডামস্ (মাইকেল ম্যাব্রিক (১৮৪৪-১৯১৩)), তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন অর্গানবাদক, পরে গায়ক ও সুরকার, তবে সমুদ্রের গান সৃষ্টিতে তাঁর বৈশিষ্ট্য, এছাড়াও তিনি অনেক বীরত্বমূলক উদ্দীপক ও ধর্মীয় গানে সুরযোগ করেছেন।[৩৫] গবেষকের গবেষণা অনুযায়ী মূলগান ও এই ভাঙাগানটির মধ্যে যেসব মিল পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে,

(ক) 'কালী কালী বল রে আজ' গানের কথা ও ভাব যদিও ইংলিশ মূলগানটি থেকে আলাদা, তবু একটি অংশে ভাঙাগানটি মূলগানের হুবহু প্রতিধ্বনি করে– 'বলো হো হো হো, বলো হো' (ভাঙাগান); 'ইয়ো হো! ল্যাডস্! ইয়ো হো! ইয়ো হো! ইয়ো হো!' (মূলগান)। ভাঙাগানটি ছন্দের দিক থেকে মুলগানটির হুবহু অনুকরণ হলেও শেষ পঙক্তিতে ৩/৩ ছন্দকে পরিবর্তন করা হয়েছে ৪/৪ ছন্দে।[৩৬]

(খ) 'কালী কালী বল রে আজ' গানটি 'হুবহু' ইংরাজি গানের অনুকরণে রচিত]। ভাঙাগানটিতে শিকারে যাওয়ার আগে দসুদল তাদের আরাধ্যাদেবী শ্যামা-মায়ের কাছে উত্তেজক ভাষায় প্রার্থনা জানায়। ভাঙাগানটির 'আরম্ভের চার পঙক্তিতে ঢিমা লয়ের ভাঙাছন্দ, পঞ্চম পঙক্তি "ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য" থেকে "হা হা হা" পর্যন্ত লয় দ্রুত। "আরে বল রে শ্যামা মায়ের জয়" থেকে বাকি শেষ অংশ গাইতে হবে মধ্যলয়ে, ছন্দ ভেঙে। গানটির শব্দোচ্চারণে ও স্বর প্রকাশের ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য দরকার হয় উদ্দীপনার ভাব প্রকাশের জন্য।'[৩৭]

(গ) 'কালী কালী বল রে আজ' গানটি কালী-বন্দনার সুর একেবারে সশরীরে একটি ইংরেজি গান Nancy Lee থেকে তোলা এবং মূলগানটিতে 'একজন নাবিক তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর গুণগান করছেন।'[৩৮]

(৩) 'মরি ও কাহার বাছা': 'গো হোয়্যার গ্লোরি ওয়েইটস্ দি'[৩৯] গানটির অনুকরণে এই ভাঙাগানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে আইরিশ কবি ও লোকগীতি-সংগ্রাহক টমাস্ ম্যুর্ (১৭৭৯-১৮৫২) অনেক প্রাচীন আইরিশ লোকগীতির সুর লিপিবদ্ধ করে 'আইরিশ মেলডিস' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করে মূলগানের কথাগুলি অনেক ক্ষেত্রে নিজের রচনায় রূপান্তরিত করেন। মূলগানটির রচয়িতা হিশেবে তাঁর নাম পাওয়া গেলেও সুরের ক্ষেত্রে প্রাচীন আইরিশ 'মেইড্ অফ দি ভেলি'র সন্ধান পাওয়া যায়। আইরিশ সুরে রচিত বনদেবীর বিলাপের গান হিশেবে, 'কালমৃগয়া'র 'মানা না মানিলি' গানটির সুরে, রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মূলগানের অর্ধলয়ে 'মরি ও কাহার বাছা' গানটি রচনা করেন।[৪০]

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পিছনে প্রধান অনুপ্রেরণা যোগিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানোর 'উত্তেজনা'য়, কখনও তাঁর রচিত সুরে বা ভারতবর্ষীয় গানের সুরে রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা' সুরের নাটকটি রচনা করেন।[৪১] 'এই সময়ে আমি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর] পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আর কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে

[৩৫] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।
[৩৬] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।
[৩৭] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।
[৩৮] রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।
[39] Go Where Glory Waits Thee; The songs of Ireland, Edited by J. L. Hatton & J. L. Molloy, Published by Boosey & Co., London.
[৪০] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।
[৪১] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।

শুনাইতাম ।'[৪২] যাদিও '[...] 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতিবাবুর সংযোজিত । তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিলেতি ঢঙে যেসব গান এই গীতিনাট্যে আছে সেগুলো রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব সংযোজন ।'[৪৩]

বিলেতি-সঙ্গীতে সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন লয়ের সমাবেশ সাধারণত পরিলক্ষিত, এজন্যই রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গানগুলি পরিবেশনের সময় কথার সঙ্গে ভাবের দিকটি লক্ষ্য রেখে কখনও কখনও লয় বদলে দিয়েছেন, তাই ত ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে দ্রুত ও বিলম্বিত লয়ের তাল, সর্বত্রই যে তাল সমান রাখতে হবে এমন কথা তিনি মনে করেননি; যেমন– 'কালী কালী বল রে আজ' গানে যথাক্রমে ঢিমালয়ের ভাঙাছন্দ, দ্রুতছন্দ ও মধ্যলয়ের ভাঙাছন্দের সমাবেশ ঘটিয়েছেন ।[৪৪] বিলেতি-সঙ্গীতের ধারাকে আদর্শরূপে সামনে রেখে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় সুরের নানা পরীক্ষানিরীক্ষাও করেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'হৃদয়াবেগের উত্থানপতনকে সুরের ও কণ্ঠস্বরের ঝোঁক দিয়ে খুব করে প্রত্যক্ষ করে দেবার চেষ্টা [...] আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্র [...] বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়ালোকময়, পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখিতে পাই না ।'[৪৫] আর 'বস্তুত, বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে । [...] ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে ।'[৪৬]

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয়েও দেখা যায়, গানের সুরের মধ্যে, পাত্র-পাত্রীর হাসিকান্না, ক্রোধবিস্ময় প্রভৃতি মানবিক অনুভব যথাযথ ভাবে প্রকাশের জন্য অভিনেতারা কথোপকথনের স্বাভাবিক ঝোঁক বজায় রাখার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ বলা যায় যে, ভারতবর্ষীয় রাগিণীতে গান বাঁধা হলেও বিলেতি সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অনুভবের সাহায্যে সে গানগুলি পরিবেশন করা হয় । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '[...] রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না—কথার সঙ্গে সুর থাকে । এই কথাবার্তার-আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে । স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল । ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া চলিবে না কেন ।'[৪৭] তিনি আরও বলেছেন, 'যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করা অসংগত বা নিস্ফল হয় নাই । বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব । সংগীতের এইরূপ বন্ধন-মোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল ।'[৪৮] ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রথম অভিনীত হয় । প্রধান চরিত্রতে যাঁরা অভিনয় করেন তারা হচ্ছেন—রবীন্দ্রনাথ (বাল্মীকি), হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা (স্বারস্বতী), শরৎকুমারীদেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলা (লক্ষ্মী), কেদারনাথ মজুমদার (দস্যু) ও অক্ষয় মজুমদার (প্রধান দস্যু) । এর অভিনয় হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহিঃবাটির তেতলার ছাদে, পাল খাটিয়ে মঞ্চ তৈরি করে ।[৪৯] দর্শকদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল গুপ্ত, তারকনাথ পালিত, আচার্য্য শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কানাইলাল, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রমুখ ।[৫০] বঙ্কিমচন্দ্র এর অভিনয় দেখে তৃপ্তিপ্রকাশ করেছিলেন । 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয়ের কথা উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকি-

[৪২] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ ।
[৪৩] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ ।
[৪৪] সংগীত ও ভাব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (প্রথম প্রকাশ: ভারতী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) ।
[৪৫] সংগীত ও ভাব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (প্রথম প্রকাশ: ভারতী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) ।
[৪৬] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ।
[৪৭] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ।
[৪৮] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ।
[৪৯] জীবনস্মৃতি, দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি ও প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮ ।
[৫০] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ ।

প্রতিভা' পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না।'[৫১] আর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কবিতাও লিখেছিলেন,

উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ, ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।
হেরো তাহে প্রাণ ভ'রে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না আর।[৫২]

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয়ের কথা সবিস্তারে বিবরণসহ প্রকাশিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে 'সাধারণী' সাপ্তাহিক পত্রিকায়, '[...] 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামে একখানি অবিনব গীতিকাব্য অভিনীত হয়। বাল্মীকি সরস্বতী কৃপায় দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কিরূপে অমর কবিত্ব লাভ করেন তাহা প্রদর্শন করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বাল্মীকি হন আর 'প্রতিভা' নাম্নী প্রতিভাসম্পন্না তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া ভ্রাতুষ্কন্যা বাগ্‌দেবী রূপে অভিনয় করেন। বঙ্গ কুল-কুমারী কর্ত্তৃক রঙ্গ-বেদী এই প্রথম উজ্জ্বলীকৃত হইল। বঙ্গ রঙ্গ-ভূমির নব কলেবরের এই অভিষেক ক্রিয়ার প্রতিভা উপযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বটেন। তিনি সুকণ্ঠা, গীতি নিপুণা, সতেজ-নয়না এবং ধীরপদ বিক্ষেপ-কারিণী। তাঁহার গীতাভিনয়ে দর্শকবৃন্দের অনেকে বিস্মিত এবং প্রীত হইয়াছিলেন।'[৫৩] 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মঞ্চসজ্জাও ছিল অন্যরকম। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মঞ্চসজ্জার 'যে বর্ণনা রেখে গেছেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে তাতে তার সাক্ষ্য মেলে। দুটো তুলোর বক, খড়ভরা একটা মরা হরিণ, সীনে আঁকা কচুবনে বরাহ ও বটের ডালপাল লাগানো হয়েছিল মঞ্চে। টিনের নল দিয়ে বর্ষার গানের সময় মঞ্চে জল ছাড়া, আয়না দিয়ে বিদ্যুতের আলো, টিন বাজিয়ে কড়কড় শব্দ, দোতলার ছাদ থেকে দুটো দম্বল গড়গড় করে এধার ওধার গড়ানো, টাট্টুঘোড়ার পিঠে লুঠের মাল নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ এবং ঘোড়াকে মঞ্চে ঘাসটাস খাওয়ানোর দৃশ্যে নিমন্ত্রিত মেম ও সাহেবেরা মহাখুশী হয়েছিলেন।'[৫৪]

কালমৃগয়া[৫৫]

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে (আশ্বিন ১২৮৯ বঙ্গাব্দে) রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'কালমৃগয়া'; এর নাট্যবিষয়টি রামায়ণে বর্ণিত রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুবধের আখ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে।[৫৬] তবে তিনি যেরকম উৎসাহ নিয়ে 'কালমৃগয়া' রচনা করেন সেরকম উৎসাহ নিয়ে আর-কিছুই রচনা করেননি।[৫৭] তারপর রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'কে ভেঙে নূতনভাবে সাজিয়ে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র

[৫১] বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮৮।
[৫২] গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী।
[৫৩] 'সাধারণী' সাপ্তাহিক, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১।
[৫৪] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।
[৫৫] টীকা: 'কালমৃগয়া' প্রকাশিত হয় ৫ই ডিসেম্বর ১৮৮২। বেঙ্গল লাইব্রেরির তথ্য অনুযায়ী গ্রন্থের মুদ্রণসংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০ কপি, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৮, আকার—১২.৫ সে.মি. বাই ৮.৫ সে.মি.। আখ্যাপত্র ছাড়াই গ্রন্থটা প্রকাশিত হয়। মলাটের উপর লেখা ছিল—'কালমৃগয়া ।/ (গীতি-নাট্য)/ বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে/ অভিনয়ার্থ/ রচিত ।/ কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও/ প্রকাশিত ।/ অগ্রহায়ণ ১২৮৯ ।/ মূল্য চারি আনা ।' – রবীন্দ্রগ্রন্থপুঞ্জী।
[৫৬] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।
[৫৭] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন, কারণ বনদেবীর অংশ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম সংস্করণে ছিল না, এবং এই অংশটি 'কালমৃগয়া' থেকেই নেওয়া হয়, আর 'কালমৃগয়া'র রাজবিদূষক রূপান্তরিত হয় প্রথম দস্যুতে।[৫৮] 'কালমৃগয়া এখন অচলিত গ্রন্থ; ১২৯২ সালে বাল্মীকিপ্রতিভার নূতন সংস্কারণ তৈয়ারি করিবার সময়ে কবি কালমৃগয়ার বহু গান ও দৃশ্য সুনিপুণভাবে বাল্মীকিপ্রতিভার সহিত মিশাইয়া দিয়া উহাকে পূর্ব হইতে বহুগুণে সুন্দর করিয়াছিলেন। ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথেরই জয় হইয়াছিল, কিন্তু আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথেরও পরাজয় হয় নাই। দুইটি অসম্পূর্ণ নাটক মিলাইয়া একটি অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত নাটক তিনি রচনা করিলেন।'[৫৯] 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণের কারণে রবীন্দ্রনাথ 'কালমৃগয়া' পুনঃপ্রচারে অনাগ্রহী ছিলেন, কারণ 'পরে, এ-গীতিনাট্যের অনেকটুকু অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।'[৬০]

'কালমৃগয়া' যেহেতু সুরের নাটিকা সেহেতু এর গানগুলি নিয়েই আলোচনা করা প্রয়োজন। 'কালমৃগয়া'য় সে-সময়কার সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশিত হওয়ার কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গানগুলিকে ওস্তাদি কায়দায় পিয়ানোতে ফেলে যথেচ্ছা মন্থন করেন।[৬১] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গানগুলি একটু ভেঙে 'কালমৃগয়া' তৈরি করা হয়।[৬২] আর 'কালমৃগয়া' সুরের নাটকের বর্তমান সংস্করণে যেসব গান পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে,

প্রথম দৃশ্য: তপোবন—'বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি' (মিশ্র ভূপালী, যৎ); 'ও ভাই, দেখে যা' (মিশ্র খাম্বাজ, কাওয়ালি); 'ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে' (মিশ্র খাম্বাজ, আড়খেমটা) ও 'কাল সকালে উঠব মোরা' (মিশ্র বিভাস, আড়খেমটা)।

দ্বিতীয় দৃশ্য: বন—'সমুখেতে বহিছে তটিনী' (মিশ্র সিন্ধু, ঢিমে তেতলা); 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' (মিশ্র কেদার, একতালা) ও 'নেহার' লো সহচরি' (ছায়ানট, আধ্বা)।

তৃতীয় দৃশ্য: কুটীর—'জল এনে দে রে বাছা তৃষিত কাতরে' (জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল) ও 'না না কাজ নাই, যেও না বাছা' (দেশ, ঢিমে তেতালা)।

চতুর্থ দৃশ্য: বন—'সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া' (গৌড়মলার, কাওয়ালি); 'ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে' (মলার, কাওয়ালি); 'আয় লো সজনি, সবে মিলে' (মলার, কাওয়ালি); 'কি ঘোর নিশীথ, নীরব ধরা' (গারা, কাওয়ালি) ও 'মানা না মানিলি, তবু চলিলি' (মিশ্র বেলাওল, একতালা)।

পঞ্চম দৃশ্য—'বনে বনে সবে মিলে চল হো' (ইমন কল্যাণ, কাওয়ালি); 'জয়তি জয় জয় রাজন্ বন্দি তোমারে' (সিন্দড়া, তালের উল্লেখ নেই); 'গহনে গহনে যা রে তোরা' (বাহার, তালের উল্লেখ নেই); 'চল্ চল্ ভাই' (অহং, কাওয়ালি); 'প্রাণ নিয়ে ত সট্‌কেছি রে' (দেশ, খেমটা); 'ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়' (শঙ্করা, তালের উল্লেখ নেই); 'আঃ বেঁচেছি এখন' (মিশ্র সিন্ধু, তালের উল্লেখ নেই); 'এনেছি মোরা এনেছি মোরা' (রাগ বা তালের উল্লেখ নেই); 'কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে' (মিশ্র মলার, পোস্ত); 'না জানি কোথা এলুম' (খাম্বাজ, কাওয়ালি); 'হায় কি হ'ল! হায় কি হ'ল' (ভৈরবী, তালের উল্লেখ নেই); 'কি করিনু হায়!' (বেহাগ, আড়াঠেকা) ও 'কি দোষ করেছি তোমার' (খট, ঝাঁপতাল)।

ষষ্ঠ দৃশ্য: কুটীর—'আমার প্রাণ যে আকুল হয়েছে' (মিশ্র ঝিঁঝিট খাম্বাজ, মধ্যমান); 'বল বল পিতা, কোথা সে গিয়েছে' (রামকেলী, কাওয়ালি); 'কে জানে কোথা সে' (বেহাগ, কাওয়ালি); 'এতক্ষণে বুঝি এলি রে'

[৫৮] রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
[৫৯] রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১৩৪০।
[৬০] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।
[৬১] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।
[৬২] ঘরোয়া, অবনীন্দ্রনাথ।

(সিন্ধু, চৌতাল); 'অজ্ঞানে কর হে ক্ষমা' (রাজবিজয়ী, তালের উল্লেখ নেই); 'কী বলিলে, কী শুনিলাম, একি কভু হয়!' (বাহার, ঢিমে তেতালা); 'ক্ষমা কর মোরে তাত' (মিশ্র ভূপালি, কাওয়ালি); 'আহা, কেমনে বধিল তোরে!' (কাফি, আড়াঠেকা); 'শোক তাপ গেল দূরে' (নটনারায়ণ, তালের উল্লেখ নেই); 'যাও রে অন্তধামে মোহ মায়া পাশরি' (প্রভাতী, তালের উল্লেখ নেই) ও 'সকলি ফুরাল স্বপন প্রায়' (ঝিঁঝিট খাম্বাজ, একতাল)।[৬৩]

'কালমৃগয়া'র যে-কয়েকটি গান অপরিবর্তিত বা সংক্ষেপিত বা অল্পপরিবর্তিত আকারে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হয় সেগুলি হচ্ছে– (১) 'বনে বনে সবে মিলে চল হো' [অল্পপরিবর্তিত]; (২) 'গহনে গহনে যা রে তোরা' [অপরিবর্তিত]; (৩) 'চল্ চল্ ভাই' [অপরিবর্তিত]; (৪) 'প্রাণ নিয়ে ত সট্‌কেছি রে' [সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত]; (৫) 'ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়' ['ঠাকুরমশয়' শব্দটির বদলে 'সর্দারমশায়']; (৬) 'আঃ বেঁচেছি এখন' [সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত]; (৭) 'এনেছি মোরা এনেছি মোরা' [পরিবর্তিত]; (৮) 'কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে' [অপরিবর্তিত]। প্রসঙ্গত, 'কালমৃগয়া'র প্রথম তিনটি দৃশ্যের গানগুলি এবং চতুর্থ দৃশ্যের প্রথম তিনটি গান, প্রতিভাসুন্দরী দেবী-কৃত স্বরলিপিসহ 'বলাকা' পত্রিকার ১২৯২ খ্রিস্টাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মতই 'কালমৃগয়া'রও কয়েকটি গানে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিলেতি সুর ব্যবহার করেন, সেগুলি হচ্ছে—(১) 'তুই আয় রে কাছে আয় (ও ভাই, দেখে যা)'; (২) 'ও দেখ্‌বি রে ভাই আয় রে ছুটে'; (৩) 'কাল সকালে উঠব মোরা'; (৪) 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে'; (৫) 'মানা না মানিলি, তবুও চলিলি'; (৬) 'সকলি ফুরালো স্বপন প্রায়'; আর (৭) 'এনেছি মোরা এনেছি মোরা'।

(১) 'ও ভাই, দেখে যা': মূলগানটি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিশেষ এক জনপ্রিয় গান, যা রেজিমেন্ট্যাল মার্চসঙ্গীত হিশেবে গৃহীত হয়। মূলগানের কথাগুলি ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের রচনা, আর ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার নাওয়ালে'স 'ডিলাইট' নামে একটি প্রাচীন ইংলিশ সুরে গানটিকে নিবদ্ধ করেন।[৬৪]

(২) 'ও দেখ্‌বি রে ভাই আয় রে': মূলগানটি হচ্ছে 'দি ভিকার অফ ব্রে'[৬৫], যার নায়ক ছিলেন একজন বাস্তব পুরুষ; তিনি তার ধর্মযাজকপদ অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসকবর্গের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেন। তিনি নিজ ধর্মমত কয়েকবার পরিবর্তন করেছিলেন– যেমন, তৃতীয় কিং হেনরির সময় প্রথমে রোমন ক্যাথলিক পরে প্রোটেস্টান্ট, ষষ্ঠ কিং এডোয়ার্ড-এর সময় প্রাটেস্টান্ট, কিউইন ম্যারির সময় রোমান ক্যাথলিক এবং কিউইন এলিজ্যাভেদ প্রথম-এর সময় প্রোটেস্টান্ট হন। সে-যুগে আরও অনেক ধর্মযাজক ছিলেন যারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য নিজেদের ধর্মমত পরিবর্তন করতে দ্বিধা করতেন না। 'ব্রে' শহরটি ইংল্যাণ্ডের বার্কশায়ারে অবস্থিত; বার্কশায়ারের একটি প্রচলিত প্রবাদ—'দি ভিকার অফ ব্রে উইল বি ভিকার স্টিল' যা মূলগানে রূপ পেয়েছে। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের অন্য-একটি গান 'দি রিলিজিয়াস টার্নকোট'-এর কথাগুলি এই মূলগানের উৎস। সেই গানটি অবশ্য গাওয়া হত 'লণ্ডন ইজ অ্যা ফাইন টাউন' গানের সুরে। মূলগানটি বহুদিন যাবৎ একটি স্কচ সঙ্গীত 'বিইসি ব্যাল্ এ্যাণ্ড মেরি গ্রে'-এর সুরে গাওয়া হত, তবে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই গানটি একটি নূতন সুরে পরিবেশিত হয়ে আসছে, যা ইংল্যাণ্ডের মরিস্ ড্যান্সারদের মধ্যে এখনও প্রচলিত।[৬৬] মূলগানের ছন্দ ৪/৪ আর ভাঙাগানের ছন্দ ৩/৩।

[৬৩] কালমৃগয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।

[৬৪] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।

[65] The Vicar of Bray; 'News-Chronicle' Song Book, Compiled & Edited by T. P. Ratchiff, Published by 'News-Chronical' Publications Department, London.

[৬৬] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।

(৩) 'কাল সকালে উঠব মোরা': এই গানের সুর রবীন্দ্রনাথ এনেছেন 'পুরানো সেই দিনের কথা' থেকে, যা 'অল্ড্ ল্যাঙ জাইন'[৬৭] গানটি আনা; তাই 'পুরানো সেই দিনের কথা' ও 'অল্ড্ ল্যাঙ জাইন' গান-দুটো নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা আবশ্যক। মিশ্র-ভূপালী আর একতালে নিবদ্ধ 'পুরানো সেই দিনের কথা'তে অতীতের সুখস্মৃতি রোমঞ্চনের যে-ভাবটি ফুটে ওঠে তা স্কচ মূলগান 'অল্ড্ ল্যাঙ জাইন' বা 'পুরাতন পরিচয় বুঝি ভোলা যায়'তে পরিলক্ষিত হয়। গানের আরম্ভে প্রশ্নসূচক পঙক্তি দুটো মূলগানের প্রথম দুটো পঙক্তির প্রতিধ্বনি বহন করে। তাছাড়াও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মূলগানের কোনও কোনও পঙক্তি ভাঙাগানে প্রায় অনূদিত হয়েছে।[৬৮] 'অল্ড্ ল্যাঙ জাইন' গানটি হচ্ছে একটি প্রাচীন স্কচ লোকগীতি। স্কচরা যখনই পরদেশে বসবাস করতে গিয়েছে তখনই এই গানটিকে তাদের মাতৃভূমির স্মারক হিশেবে সঙ্গে নিয়ে গেছে। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে যখন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রচুর লোক অ্যামেরিকায় পাড়ি জমায় তখন এই গানটিও তাদের সঙ্গে যায়, এবং সেখানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জনপ্রিয় গান হিশেবে এখনও এই গানটি গণ্য হয়। বর্তমানে গানটি পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই পরিচিতি লাভ করেছে; যে-কোনও ফেয়্যারওয়েলে গানটি পরিবেশন করার একটি রেওয়াজ দেখা যায়। নববর্ষের প্রথম ঘণ্টা যখন বাজতে শুরু করে তখন সকলে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাত আড়া-আড়িভাবে একে-অন্যকে ধরে গানটি পরিবেশন করে। গানের তালে তালে হাতের শিকলও ওঠানামা করে। এই গানটির মূলকথা সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে এ-থেকে জানা যায় যে, ব্রিটেনের রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে (১৬২৫-১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে) 'অল্ড্ ল্যাঙ জাইন' উক্তিটি খুব জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তী সময়ে এই উক্তিকে প্রয়োগ করে অনেক গান রচনা করা হয়। 'সোড অল্ড্ একোইসটেন্স্ বি ফোর্গোট এ্যাণ্ড নেভার টাচ্ আপন' গানের কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান গানটি নেওয়া হয়। রবার্ট বার্নস্ (১৭৫৯-১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ) নামে একজন বিখ্যাত স্কচ কবি ও লোকগীতি-সংগ্রাহক ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এই গানটি একজন বৃদ্ধ মেষপালকের মুখ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তখন তিনি জেমস্ জন্সনের 'স্কটিস্ মিওজিকেল্যা মিওজিয়াম' গ্রন্থের জন্য লোকগীতি সংগ্রহ-কাজে সে-অঞ্চল ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। রবার্ট বার্নস্ মৃত্যুবরণ করার আগে নিজের রচিত দুটো স্তবক মূলগানের সঙ্গে সংযোগ করেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে এই গানটি 'এ্যা সিলেক্ট কালেক্শন্ অফ অরিজিন্যাল স্কটিস্ এ্যায়ার' গ্রন্থে তাঁর রচনা হিশেবে গ্রহীত হয়। মূলগানের সুরও খুব প্রাচীন। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের আগেই তার প্রচলন ছিল। পণ্ডিতরা বলেছেন যে, 'আই ফেড্ এ্যা লেড্', 'দি মিলার'স্ ওয়েডিং', 'দি মিলার'স্ ডোয়টার' প্রভৃতি গানে ব্যবহৃত প্রাচীন এক স্কচ সুর বর্তমান গানে আরোপ করা হয়। তাছাড়াও 'কামিং থ্রও দি রাই' নামে একটি গানের সুরের সঙ্গে এর সাদৃশ্য পাওয়া যায়।[৬৯]

(৪) 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে': এই গানের সঙ্গে স্কচ 'ই ব্যাঙ্কস্ অ্যাণ্ড ব্রেজ্'[৭০]-এর বর্ণনার অনেক সাদৃশ্য আছে। নদীর জল, মৃদু হাওয়া, ফুলের সমারোহ, পাখির কাকলি—সবকিছু মিলিয়ে একটি উদাস ভাব সৃষ্টি হয়; এরই প্রতিচ্ছবি দুটো গানেই পাওয়া যায়; কিন্তু মূলভাবের দিক থেকে বিচার করলে দুটোর মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মূলগানে বিরহের দুঃখজনিত ঔদাস্য ও ভাঙাগানে চরম আনন্দের ঔদাস্য ধ্বনিত হয়েছে। আনন্দ ও দুঃখ—এই বিপরীত দুটো অনুভবেরই চরম পর্যায়ে কিন্তু একই ঔদাস্যের অনুভূতি—এই তত্ত্বটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এই দুটো বিপরীত ভাবের গানে। মূলগানটির সরল সুরের কাঠামোটি রক্ষিত হলেও 'তান'-এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বহু ছোট ছোট অলঙ্কার যুক্ত হওয়ায় এই ভাঙাগানটি ভারতবর্ষীয় গান হয়ে উঠেছে।[৭১] মূলগানের রচয়িতা রবার্ট বার্নস্। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি একজন বিখ্যাত স্কচ কবি ও লোকগীতি-সংগ্রাহক

---

[67] Auld Lang Syne; McDougall's English Songster, Complied & Edited by Edward Mason, Published by McDougall's Educational Company Ltd, London, Edinburgh.

[৬৮] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।

[৬৯] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।

[70] Ye Banks And Braes, 'News-Chronicle' Song Book, Compiled & Edited by T. P. Ratchiff, Published by 'News-Chronical' Publications Department, London.

[৭১] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।

ছিলেন। তিনি অনেক প্রাচীন লোকগীতিকে নিজের রচনা হিশেবে নিজস্বীকরণ করেন। মূলগানের সুর একাট প্রাচীন স্কচ গান 'ক্যালডনিয়ান হান্টস্ ডিলাইট' থেকে নেওয়া। সুরকার ছিলেন জেমস্ মিলার।[৭২]

(৫) 'মানা না মানিলি, তবুও চলিলি': এই গানটি 'গো হোয়্যার গ্লোরি ওয়েইটস্ দি'[৭৩] গানের সুর অবলম্বন করে রচিত। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে আইরিশ কবি ও লোকগীতি-সংগ্রাহক টমাস্ ম্যুর্ (১৭৭৯-১৮৫২) 'আইরিশ মেলডিস' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করার সময় অনেক প্রাচীন আইরিশ লোকগীতির সুর তিনি লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু মূলগানের কথাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই নিজের রচনায় রূপান্তরিত করেন। বর্তমান গানের রচয়িতা হিশেবে তাঁরই নাম পাওয়া যায়, আর এই গানের সুর নেওয়া হয়েছিল প্রাচীন আইরিশ 'মেইড্ অফ দি ভেলি' গানটি থেকে।[৭৪] মূলগানের অর্ধলয়ে রচিত এই ভাঙাগানটি।

(৬) 'সকলি ফুরালো স্বপনপ্রায়': এই গানটি হচ্ছে আইরিশ্ 'রবিন অ্যাডেয়ার'[৭৫]-এর ভাবার্থ। এখানে নায়ক 'রবিন অ্যাডেয়ার'-এর প্রেমিকার কাছে বিশ্বসংসার শূন্য বলে প্রতিভাত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালমৃগয়া'তে সেই শূন্যতার ভাবটি ফুটিয়ে তুলেন ঋষি-কুমারের মৃত্যুর মাধ্যমে; তাছাড়া ভাঙাগানের একাধিকবার ব্যবহৃত 'কোথা সে হায়?' প্রশ্নবাহিত নৈরাশ্যও 'রবিন অ্যাডেয়ার' গানের প্রশ্নবহুল বাক্যগুলির প্রভাব বহন করে।[৭৬] মূলগানটি স্কচ গান বলে ভাবা হলেও প্রকৃতপক্ষে গানের সুর নেওয়া হয়েছে প্রাচীন আইরিশ্ সুর থেকে। মূলগানটি রচনা করেন ল্যাডি কেরোলিন কেপেল তাঁর প্রেমিক আইরিশ্ ম্যাডিকেল স্টুডেন্ট রবিন অ্যাডেয়ারের উদ্দেশে। পারিবারিক অনেক বাঁধা লঙ্ঘন করে অবশেষে ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে রবিন তাঁর স্বামী হন; তিনি পরে ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের চিকিৎসক হিশেবে নিযুক্ত হন। ১৭ শতকের একটি আইরিশ্ 'এলীন অ্যারন' গানের সুরে ক্যারল ডালি নামক একজন তরুণ কবি ও সুরকার এই গানে সুর আরোপ করেন।[৭৭]

(৭) 'এনেছি মোরা এনেছি মোরা': এই গানটিকে শান্তিদেব ঘোষ[৭৮] ভাঙাগান হিশেবে উল্লেখ করলেও ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী[৭৯] একে বিলেতি সুরের ভাঙাগান হিশেবে অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেছেন।

২৩শে ডিসেম্বর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 'কালমৃগয়া' প্রথমবারের মত অভিনত হয়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মতই তেতলার ছাদে স্টেজ বেঁধে এর অভিনয় হয়।[৮০] অভিনয় করেন– জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (দশরথ), রবীন্দ্রনাথ (অন্ধমুনি), হেমেন্দ্রনাথের ছেলে ঋতেন্দ্রনাথ (অন্ধমুনির পুত্র), হেমেন্দ্রনাথের মেয়ে অভিজ্ঞাদেবী (অন্ধমুনির কন্যা) এবং ঠাকুর পরিবারের অন্য মেয়েরা বনদেবীর ভূমিকায়।[৮১] বনদেবীর দৃশ্য দিয়েই 'কালমৃগয়া' শুরু হয়। ইন্দিরাদেবী বলেছেন, 'আমি ও উষাদিদি কালমৃগয়া-য় বনদেবী সেজে 'সম্মুখেতে বহিছে তটিনী' গানটিতে এক জায়গায় বসে ডান হাতের ভঙ্গিতে সামনের দিকে কেমন তটিনী বয়ে যাচ্ছে আর দু-আঙুল উপরে তুলে 'দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া' দেখাতাম, সে গল্প করে সেদিন পর্যন্ত কত মেয়েদের হাসিয়েছি। [...] বনদেবীদের 'রিমঝিম' প্রভৃতি গানের সঙ্গে নৃত্যে অতি প্রাথমিক ড্রিল-এর মতো একপ্রকার নাচ শেখানো হত, যা দেখে এখনকার নৃত্যপটীয়সীরা

[৭২] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।

[73] Go Where Glory Waits Thee, The songs of Ireland, Edited by J. L. Hatton & J. L. Molloy, Published by Boosey & Co., London.

[৭৪] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।

[75] Robin Adair, 'News-Chronicle' Song Book, Compiled & Edited by T. P. Ratchiff, Published by 'News-Chronical' Publications Department, London.

[৭৬] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।

[৭৭] বিলাতীগান– ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত, অনুরাধা পালচৌধুরী, ১৯৮৭।

[৭৮] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।

[৭৯] রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

[৮০] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।

[৮১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মন্মথনাথ ঘোষ।

বোধ হয় তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবেন।'[৮২]ছোট ছোট মেয়েরা বনদেবী সেজে, স্টেজে নেমে, মঞ্চ ঘুরে ঘুরে গান করে। অবশ্য বর্তমান ধারার নাচ ছিল না; শুধু হাত পা নেড়েই গান পরিবেশন করে তারা। এরসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পোষা হরিণও স্টেজে নামে।[৮৩] 'কালমৃগয়া'র করুণরসে দর্শকরা অত্যন্ত বিচলিত হন।[৮৪] হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা 'কালমৃগয়া'র অভিনয় সম্বন্ধে বলে, '[...] The actors and actresses were for the most part the children of the family, and the performance was simply exquisite. It would be invidious to sigle out any particular character, when all acquitted themselves so well.'[85]

মায়ার খেলা[৮৬]

স্বর্ণকুমারীদেবীর প্রতিষ্ঠিত 'সখিসমিতি'র অন্যতম সদস্য সরলা রায়ের অনুরোধে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখতে শুরু করেন 'মায়ার খেলা'; তিনি তখন তাঁর পিঠের একটি 'ফোড়া'র জন্য শয্যাশায়ী; ইন্দিরাদেবী বলেছেন, 'এখনো মনে পড়ে আমাদের পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির তেতলার ঘরে রবিকাকা একটি একহারা খাটে উপুড় হয়ে পড়ে বুকে বালিশ দিয়ে শেটের উপর মায়ার খেলার গান লিখছেন এবং গুন গুন করে সুর দিচ্ছেন।'[৮৭] বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনি 'মায়ার খেলা'র রচনা করেন; প্রতিদিন এক-দুটো করে গান তৈরি করে সরলাদেবীকে শিখিয়ে দিতেন।[৮৮] 'মায়ার খেলা'র হচ্ছে একটি পুরোপুরি সুরের নাটক, তবে কোনও পৌরাণিক-কাহিনী অবলম্বনে এ রচিত হয়নি, বরং 'কড়ি ও কোমল' পর্বের 'যৌবন-সৌন্দর্যপ্রতি'[৮৯] নায়িক কামনা ও 'মানসী' পর্বের 'মানস-সুন্দরীর 'অরূপমূর্তি'-অদর্শনজনিত বেদনা'[৯০]– এই দুই-এর মাঝে কবির মন যখন দুলছিল তখনই 'মায়ার খেলা' রচনা করার জন্য তিনি অনুভব করেন; তবে এর নাট্য মুখ্য নয়, গীতই মুখ্য; এর গল্পাংশের মধ্যে 'নূতনত্ব কিছু নাই, পূর্ব-প্রকাশিত গদ্য-নাটক 'নলিনী'র ছায়াবলম্বনে'[৯১]-ই নাটকটি রচিত হয়, যা কোনও সমাজ বা দেশ বিশেষে আবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের কল্পরাজ্যে 'সমানিয়মের প্রাচীর' তোলার আবশ্যকতাও বিবেচনা করেননি, কেবল বিনীতভাবে ভরসা করেন, এই নাটকটি যেন সাধারণ মানব-প্রকৃতি বিরুদ্ধ কিছু না হয়।[৯২] রবীন্দ্রনাথ যখন এই সুরের নাটকটি লিখছেন তখন তাঁর মন গানের রসেই অভিষিক্ত ছিল, তাই একটি মাত্র বিলেতি সুরের ভাঙাগান 'আহা আজি এ বসন্তে' গানটি ('মানা না মানিলি' গানটির সুরেই রচিত) ছাড়া অন্যগুলি ভারতবর্ষীয় গানের সুরেই রচিত।[৯৩]"বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'র সঙ্গে 'মায়ার খেলা'র যে প্রকৃতিগত ব্যবধান আছে সে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'মায়ার খেলা বলিয়া আর একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটি ভিন্ন জাতের জিনিস। [...] বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা'

[৮২] ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা, রবীন্দ্রস্মৃতি।
[৮৩] ঘরোয়া, অবনীন্দ্রনাথ।
[৮৪] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।
[85] The Hindo Patriot; 25 December 1882.
[৮৬] টীকা: 'মায়ার খেলা' প্রথম প্রকাশিত হয় ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। বেঙ্গল লাইব্রেরির তথ্য অনুযায়ী—পৃষ্ঠা—[২], 'বিজ্ঞাপন' ও 'সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা' ১৭০, ৬৪। আখ্যাপত্রে লেখা আছে—মায়ার খেলা।/ গীতিনাট্য।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য আট আনা। আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত/ ও প্রকাশিত। ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড।/ অগ্রহায়ণ ১৮১০ শক। আর আখ্যাপত্রের পেছনে লেখা আছে—'এই গ্রন্থের স্বত্ব সখিসমিতিকে দান করা হইল।/ গ্রন্থকার।' – প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা।
[৮৭] রবীন্দ্রস্মৃতি, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।
[৮৮] জীবনের ঝরাপাতা, সরলাদেবী চৌধুরাণী, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।
[৮৯] রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১৩৪০।
[৯০] রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১৩৪০।
[৯১] রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১৩৪০।
[৯২] প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা।
[৯৩] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।

যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।'[৯৪] আর 'বাল্মীকি-প্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। [...] মায়ার খেলার গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।'[৯৫]

'মায়ার খেলা'র আখ্যাভাগ হচ্ছে এরকম– 'নবযৌবন' বিকশিত অমর তার 'আপন মানসী মূর্তির অনুরূপ'[৯৬] প্রতিমাকে খুঁজতে 'উদাসভাবে' জগতে বের হয়। অন্যদিকে শান্তা নিজের প্রাণমন সমর্পণ করে অমরকে, তাকে ভালোবাসে। কিন্তু 'চিরদিন নিতান্ত' কাছে থাকাতে শান্তার প্রতি অমরের ভালোবাসা, প্রেম জন্মাতে পারেনি। অমর শান্তার মনের ভাব বুঝতে পারেনি। তাই ত মায়াকুমারীরা বলে, 'কাছে আছে দেখিতে না পাও,/ কাহার সন্ধানে দূরে যাও!'[৯৭] অমর মানুষের প্রেমকে উপেক্ষা করেই তার কাল্পনিক 'মানসী প্রিয়া'র উদ্দেশে যাত্রা করে। তবুও সে অনেক খোঁজাখুঁজি করে তার 'মানসী মূর্তির অনুরূপ' প্রতিমার সন্ধান পায় না। অবশেষে সে এক উপবনে এসে হাজির হয়। এখানে প্রমদার সাক্ষাৎ পায়। তাকে দেখা মাত্রই তার মনে এক 'নূতন আনন্দ নূতন প্রাণের সঞ্চয়'[৯৮] হয়। অমরের মন প্রমদার প্রতি প্রবল হয়ে ওঠে, প্রেমের উন্মেষ ঘটে, তাকে ভালোবেসে ফেলে। প্রমদারও হৃদয়ে প্রেমের ব্যাকুলতা বেড়ে যায়; তাই হয়ত 'অশোক ও কুমার'কে উপেক্ষা করে অমরকে ভালোবেসে ফেলে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অমর তার ব্যাকুল প্রেম প্রমদাকে নিবেদন করে, এবং তার কাছে প্রেম ব্যক্ত করে। কিন্তু প্রমদার সখীবৃন্দ তাকে 'প্রচুর ভর্ৎসনা' করে ফিরিয়ে দেয়। 'সরলহৃদয়' অমর হতাশ্বাস হয়ে ফিরে আসে; প্রমদাও লজ্জা ও সংকোচে তার মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে বাধা দিতে 'অবসর' পায় না। তারপর যখন সখীরা বুঝতে পারে প্রমদার মনের কথা তখন তারা অমরকে আহ্বান করে। অমর ফিরে না, তাদের কথা বুঝতে পারে না। ব্যর্থ প্রেমে প্রমদার মন ভেঙে পড়ে, 'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,/ এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।'[৯৯] প্রমদার কাছে ব্যর্থ হওয়ার ফলে অমর সন্ধান করে কাছের মানুষের, শান্তার; তাই 'অসুখী অশান্ত আশ্রয়হীন' অমর 'অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন অনুভব' করে ফিরে আসে শান্তার কাছে। অমর 'আত্মসমর্পণ' করে শান্তার কাছে। শান্তা ও অমরের চলে মিলনোৎসব। অমর যখন 'পুষ্পমালা' শান্তার গলায় দিতে যাচ্ছে, তখন 'ম্লান ছায়ার ন্যায়' প্রমদা মিলনসভায় এসে হাজির হয়। 'সহসা অনপেক্ষিত ভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদ প্রমদার নিতান্ত করুণ দীন ভাব অবলোকন'[১০০] করে একপলকে 'আত্মবিস্মৃত' অমরের হাত থেকে মালাটি খসে পড়ে; কারণ, অমর প্রেমের মোহে উদ্‌ভ্রান্ত, তার চিত্ত চঞ্চল, অতৃপ্ত তার প্রেম। মালা খসে যাওয়া দেখে শান্তার মনে উদয় হয় যে, অমর ও প্রমদা গোপন-প্রেমে আবদ্ধ, আর তখন সে অমর ও প্রমদার 'মিলনসংঘটনে প্রবৃত্ত' হয়; কারণ, তার প্রেম স্নিগ্ধময়, শান্তময়, প্রেমময়, গভীরতায় ভরা; কিন্তু অমরের সঙ্গে মিলন হওয়াতে প্রমদা বাধ সাধে; কারণ, তার অহংকার ও চঞ্চলতায় সে যে ভুল করেছিল তা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে জানে এই মালা গ্রহণ করলে সে সুখী হতে পারবে না। তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রেমের আসল রূপ, তাই সে বলে, '[...] এ মালা তোমরা পরো, তোমরা সুখে থাকো।'[১০১] শান্তাও প্রেমের স্বরূপ বুঝতে পারে। তাই অমরের 'দুঃখের ভার' বহন করতে শান্তা পুষ্পমালা গ্রহণ করে। অমর ও শান্তার মিলন ঘটে; কিন্তু প্রমদা শূন্যহৃদয়ে তার জায়গায় ফিরে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই সুরের, নাটকের মধ্য দিয়ে, প্রকাশ করেন– মানুষের প্রেমের গভীরতা, দৃঢ়চিত্ততা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা; একইসঙ্গে আত্মত্যাগ, ভগ্নহৃদয়; না-বুঝে, না-জেনে

[৯৪] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।
[৯৫] সূচনা, বাল্মীকিপ্রতিভা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।
[৯৬] প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা।
[৯৭] প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা।
[৯৮] প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা।
[৯৯] প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা।
[১০০] প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা।
[১০১] প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা।

কাছের মানুষকে উপেক্ষা করে দূরে চলে গিয়ে সে যে দুঃখ ও বিরহের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে একদিন সত্যিকার ও পরিপূর্ণ প্রেমের সন্ধান পায় তার কথা।

রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' সরলা রায়কে 'সাদর উপহার স্বরূপে' সমর্পণ করেন।[১০২]

'মায়ার খেলা'র প্রথম অভিনীত হয় ২৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে 'বেথুন' স্কুলপ্রাঙ্গণে, 'প্রথম উদঘাটিত শিল্পমেলা'য়। নারীরা সেদিন পুরুষের মত সামনের সারিতে বসে এর অভিনয় দেখেছিলেন। তারা এর অভিনয় দেখে বিশেষ 'সন্তোষ প্রকাশ'[১০৩] ও 'নূতন আমোদ'[১০৪] অনুভব করেছিলেন। '[...] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মায়ার খেলা নামে একখানি গীতিনাট্য বালিকাগণ-কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, দর্শক মহিলাগণ অনেকেই অভিনয়দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।'[১০৫] ঠাকুর-বাড়ির মেয়েরাই এতে অভিনয় করেন। মেয়েদেরকে 'ঈষৎ গোঁফের রেখা' টেনে সখাবেশ সাজানো হয়। তাদের পরনে ছিল 'খুব টকটকে রঙের সাটিনের পাঞ্জাবি ও ধুতি'।[১০৬] আর সরলাদেবী লিখেছেন, '[...] সেবার দাদা [শ্রীজ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল] ও সুরেন [সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর] স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন। মায়াকুমারীদের মাথায় অলক্ষ্য তারে বিজলীর আলো জ্বালানো তাঁদের একটি বিশেষ কারিগরি ছিল। আর সবাই অতি ভয়ে ভয়ে ছিল—পাছে বিজলীর তার জ্বলে উঠে মায়াকুমারীদের shock লাগে! [...] মেলাটি বেথুন স্কুলের চাতালে হয়। মেলা সুন্দর করে সাজান, স্টেজ বাঁধা, স্টল ঘেরা প্রভৃতি সব কাজেই দাদাদের ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল ক'দিন ধরে।'[১০৭]

রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে 'মায়ার খেলা'কে নৃত্যনাট্যে পরিণত করেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের 'মায়ার খেলা' রচনার পর বিলেতি সুর ভেঙে রবীন্দ্রনাথের আর সুরের নাটক রচনার দৃষ্টান্ত মিলে না। এ-সম্বন্ধে শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, '[...] 'মায়ার খেলা' রচনার পর গীতিনাট্য রচনার প্রতি উৎসাহ আর যেমন দেখা গেল না, তেমনি দেখা গেল না বিলাতি ভাঙা বাংলা গান রচনার প্রতি আগ্রহ।'[১০৮]

[১০২] প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা।
[১০৩] ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৫।
[১০৪] মিলন কথা, ভারতী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ।
[১০৫] রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: ১৩৪০।
[১০৬] রবীন্দ্রস্মৃতি, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।
[১০৭] জীবনের ঝরাপাতা, সরলাদেবী চৌধুরাণী, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।
[১০৮] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৮৭।